أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 109) www.motaher21.net

فَتَابَ عَلَيْهِ

"আল্লাহ ক্ষমা প্রদর্শন করলেন।"

" Lord pardoned him."

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৩৫

وَ قُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

তখন আমরা আদমকে বললাম, “তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়েই জান্নাতে থাকো এবং এখানে স্বাচ্ছন্দের সাথে ইচ্ছে মতো খেতে থাকো, তবে এই গাছটির কাছে যেয়ো না। অন্যথায় তোমরা দু’জন যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।”

৩৫ নং আয়াতের তাফসীর:

আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতা কর্তৃক আদমকে সিজদাহ করার নির্দেশ দেয়ার পর আদমকে যে মর্যাদা দান করেছেন সেই সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাদের উভয়ের জন্য জান্নাতকে বসবাসের স্থান করে দিলেন এবং সকল প্রকার ভোগ-সম্ভোগ দিলেন, তবে একটি গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করলেন। আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন:

(وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ)

“হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেখান থেকে ইচ্ছা খাও, কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না, হলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” (সূরা আ‘রাফ ৭:১৯)

এ থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে অর্থাৎ নিজের কর্মস্থলে খলীফা নিযুক্ত করে পাঠাবার আগে মানসিক প্রবণতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে তাদের দু’জনকে পরীক্ষা করার জন্য জান্নাতে রাখা হয়। তাদেরকে এভাবে পরীক্ষা করার জন্য একটি গাছ বাছাই করা হয়। হুকুম দেয়া হয়, ঐ গাছটির কাছে যেয়ো না। গাছটির কাছে গেলে তার পরিণাম কি হবে তাও বলে দেয়া হয়। বলে দেয়া হয় এমনটি করলে আমার দৃষ্টিতে তোমরা যালেম হিসেবে গণ্য হবে। সে গাছটি কি ছিল এবং তার মধ্যে এমন কি বিষয় ছিল যেজন্য তার কাছে যেতে নিষেধ করা হয়—এ বিতর্ক এখানে অবান্তর। নিষেধ করার কারণ এ ছিল না যে, গাছটি প্রকৃতিগতভাবে এমন কোন দোষদুষ্ট ছিল যার ফলে তার কাছে গেলে আদম ও হাওয়ার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল। আসল উদ্দেশ্য ছিল আদম ও হাওয়ার পরীক্ষা। শয়তানের প্রলোভনের মোকাবিলায় তারা আল্লাহর এই হুকুমটি কতটুকু মেনে চলে তা দেখা। এই উদ্দেশ্যে কোনো একটি জিনিস নির্বাচন করাই যথেষ্ট ছিল। তাই আল্লাহ কেবল একটি গাছের নাম নিয়েছেন, তার প্রকৃতি সম্পর্কে কোন কথাই বলেননি। এই পরীক্ষার জন্য জান্নাতই ছিল সবচেয়ে উপযোগী স্থান। আসলে জান্নাতকে পরীক্ষাগৃহ করার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, মানবিক মর্যাদার প্রেক্ষিতে তোমাদের জন্য জান্নাতই উপযোগী স্থান। কিন্তু শয়তানের প্রলোভনে পড়ে যদি তোমরা আল্লাহর নাফরমানির পথে এগিয়ে যেতে থাকো তাহলে যেভাবে শুরুতে তোমরা এ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলে তেমনি শেষেও বঞ্চিত হবে। তোমাদের উপযোগী এই আবাসস্থলটি এবং এই হারানো ফিরদৌসটি লাভ করতে হলে তোমাদের অবশ্যি নিজেদের সেই দুশমনের সফল মোকাবিলা করতে হবে, যে তোমাদেরকে হুকুম মেনে চলার পথ দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

যালেম শব্দটি গভীর অর্থবোধক। ‘যুলুম’ বলা হয় অধিকার হরণকে। যে ব্যক্তি কারো অধিকার হরণ করে সে যালেম। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম পালন করে না, তাঁর নাফরমানি করে সে আসলে তিনটি বড় বড় মৌলিক অধিকার হরণ করে। প্রথমত সে আল্লাহর অধিকার হরণ করে। কারণ আল্লাহর হুকুম পালন করতে হবে, এটা আল্লাহর অধিকার। দ্বিতীয়ত এই নাফরমানি করতে গিয়ে সে যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করে তাদের সবার অধিকার সে হরণ করে তার দেহের অংগ-প্রত্যংগ, স্নায়ু মন্ডলী, তার সাথে বসবাসকারী সমাজের অন্যান্য লোক, তার ইচ্ছা ও সংকল্প পূর্ণ করার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাগণ এবং যে জিনিসগুলো সে তার কাজে ব্যবহার করে –এদের সবার তার উপর অধিকার ছিল, এদেরকে কেবলমাত্র এদের মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু যখন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে তাদের ওপর নিজের কর্তৃত্ব ব্যবহার করে তখন সে আসলে তাদের ওপর যুলুম করে। তৃতীয়ত তার নিজের অধিকার হরণ করে। কারণ তার ওপর তার আপন সত্তাকে ধ্বংস থেকে বাঁচবার অধিকার আছে। কিন্তু নাফরমানি করে যখন সে নিজেকে আল্লাহর শাস্তি লাভের অধিকারী করে তখন সে আসলে নিজের ব্যক্তি সত্তার ওপর যুলুম করে। এসব কারণে

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ‘গোনাহ’ শব্দটির জন্য যুলুম এবং ‘গোনাহগার’ শব্দটির জন্য যালেম পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

আদম (আঃ)-কে পুনরায় সম্মানিত করা হয়

আদম (আঃ)-এর (আঃ) এটি অন্যান্য মর্যাদা ও সম্মানের বর্ণনা। ফিরিশতাগণ কর্তৃক সাজদাহ করানোর পর মহান আল্লাহ তাঁদের স্বামী-স্ত্রী উভয়কে জান্নাতে স্থান দিলেন এবং সব জিনিসের ওপর অধিকার দিয়ে দিলেন। তাফসীর ইবনু মিরদুওয়াই এ বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে যে, আবূ যার (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘হে মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আদম (আঃ) কি নবী ছিলেন?’ তিনি বলেনঃ ‘তিনি নবীও ছিলেন এবং রাসূলও ছিলেন। এমন কি মহান আল্লাহ তাঁর সামনে কথাবার্তা বলেছেন এবং তাঁকে বলেছেন, ‘তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান করো।’ অধিকাংশ মুফাস্সিরগণের ধারণা এই যে, যে জান্নাতে আদম ও তাঁর স্ত্রীকে থাকার নির্দেশ দেয়া হয় তা আসমানের ওপরের জান্নাতে ছিলো। আর কারো কারো মতে উক্ত জান্নাতটি যমীনেই ছিলো। বিস্তারিত আলোচনা সূরাহ আল আ‘রাফে আসবে ইনশা’আল্লাহ।

আদম (আঃ)-এর জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়

কুর’আনুল হাকীমের বাক্যরীতি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, জান্নাতে অবস্থানের পূর্বে হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়েছিলো। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, আহলে কিতাব ইত্যাদি ‘আলিমগণ হতে ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুসারে জানা যাচ্ছে যে, ইবলীসকে ধমক ও ভীতি প্রদর্শনের পর আদম (আঃ)-এর (আঃ) জ্ঞান প্রকাশ করে তাঁর ওপর তন্দ্রা চাপিয়ে দেন। অতঃপর তাঁর বাম পাঁজর হতে হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। চোখ খোলামাত্র আদম (আঃ) তাঁকে দেখতে পান এবং রক্ত ও গোশতের কারণে অন্তরে তাঁর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। অতঃপর বিশ্বপ্রভু উভয়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন এবং জান্নাতে বাস করার নির্দেশ দেন।

কেউ বলেন, আদম (আঃ) জান্নাতে প্রবেশের পর তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ), ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) প্রভৃতি সাহাবায়ি কিরাম (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, ইবলীসকে জান্নাত হতে বের করে দেয়ার পর আদম (আঃ)-কে সেখানে আশ্রয় দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু সে সময় তিনি একা ছিলেন। ফলে তাঁর ঘুমের অবস্থায় হাওয়া (আঃ)-কে তাঁর পাজর হতে সৃষ্টি করা হয়। আদম (আঃ)

জেগে উঠার পর তাঁকে সামনে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? তুমি কেনই বা সৃষ্টি হলে? হাওয়া (আঃ) উত্তরে বললেন, আমি একজন নারী, আপনার প্রশান্তির জন্যই আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তৎক্ষণাৎ ফিরিশতা আদম (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন তাঁর নাম কি? আদম (আঃ) বললেন, তার নাম হলো হাওয়া। তাঁরা বললেন এ দ্বারা নাম করণের কারণ কি? তিনি বলেন তাঁকে এক জীবন্ত প্রাণী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে। একপর্যায়ে মহান আল্লাহ আদম (আঃ)-কে ডাক দিয়ে বললেনঃ

يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا١۪ وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

‘হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান করো এবং তা হতে যা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার করো; কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়োনা, তাহলে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।’ (তাফসীর তাবারী ১/৫১৪)

মহান আল্লাহ আদম (আঃ)-কে পরীক্ষা করলেন

মহান আল্লাহ আদম (আঃ)-কে বললেনঃ ‘হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতের মধ্যে সুখে স্বাচ্ছন্দে অবস্থান করো এবং মনে যা ইচ্ছা তা খাও ও পান করো, আর এই বৃক্ষের নিকটে যেয়ো না।”

এই বিশেষ বৃক্ষ হতে নিষেধাজ্ঞা মহান আল্লাহ কর্তৃক আদম (আঃ)-এর ওপর একটা পরীক্ষা ছিলো। কেউ কেউ বলেন যে, বৃক্ষটি ছিলো একটি আঙ্গুর গাছ। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এটা ছিলো গমের গাছ। (য‘ঈফ,তাফসীর তাবারী ১/৫১৪) কেউ বলেছেন শীষ। (য‘ঈফ,তাফসীর তাবারী ১/৫১৪) কেউ বলেছেন খেজুর এবং কেউ কেউ ডুমুরও বলেছেন। ঐ গাছের ফল খেয়ে মানবীয় প্রয়োজন অর্থাৎ পায়খানা-প্রস্রাব দেখা দিতো এবং এটা জান্নাতের যোগ্য নয়। কেউ কেউ বলেন যে, ঐ গাছের ফল খেয়ে ফিরিশতা চিরজীবন লাভ করতেন। ইমাম ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন যে, এটা কোন একটি গাছ ছিলো যা থেকে খেতে মহান আল্লাহ নিষেধ করেছিলেন। এটা যেন কোন নির্দিষ্ট গাছ ছিলো তা কুর’আনুল কারীম বা কোন সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। তাছাড়া এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে খুবই মতভেদ রয়েছে। এটা জানার মাঝেও আমাদের কোন লাভ নেই এবং না জানলেও কোন ক্ষতি নেই। সুতরাং এ জন্য মাথা ঘামানোর প্রয়োজনই বা কি? মহান আল্লাহই এটা খুব ভালো জানেন। (তাফসীর তাবারী ১/৫২০) ইমাম রাযী (রহঃ)-ও এই ফায়সালাই দিয়েছেন। আর সঠিক কথাও এটাই বটে।

عَنْهَا-এর هَا সর্বনামটি কেউ কেউ جَنَّت-এর দিকে ফিরিয়েছেন, আবার কেউ কেউ شَجَرَ-এর দিকে ফিরিয়েছেন। একটি কিরা’আতে فَاَزَلَّهُمَا-এরূপও রয়েছে। তবে অর্থ হবেঃ ‘শায়তান তাদের দু’জনকে জান্নাত থেকে পৃথক করে দেয়।’ আর দ্বিতীয়টির অর্থ হবেঃ ‘ঐ গাছের কারণেই শায়তান দু’জনকে ভুলিয়ে দেয়।’ عَنْ শব্দটি سَبَب-এর কারণেও এসে থাকে। যেমন بُؤْفَكُ عَنْهُ-এর মধ্যে এসেছে। ঐ অবাধ্যতার কারণে তাঁদের জান্নাতী পোশাক, সেই পবিত্র স্থান, ঐ উত্তম আহার্য ইত্যাদি সব কিছুই ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তাদের বলা হয়ঃ ‘এখন পৃথিবীতেই তোমাদের আহার্য ইত্যাদি রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তোমরা সেখানেই পড়ে থাকবে এবং সেখানে

উপকার লাভ করবে।' সাপ ও ইবলীসের গল্প, ইবলীস কিভাবে জান্নাতে প্রবেশ করে, কোন পন্থায় সে কুমন্ত্রণা দেয়থ ইত্যাদি লম্বা লম্বা কাহিনী মুফাস্সিরগণ এখানে এনেছেন। কিন্তু সে সবই ইসরাঈলী বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। সূরাহ আল আ'রাফে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৩৬

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ

শেষ পর্যন্ত শয়তান তাদেরকে সেই গাছটির লোভ দেখিয়ে আমার হুকুমের আনুগত্য থেকে সরিয়ে দিল এবং যে অবস্থার মধ্যে তারা ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে ছাড়লো। আমি আদেশ করলাম, "এখন তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করতে ও জীবন অতিবাহিত করতে হবে।"

৩৬ নং আয়াতের তাফসীর:

সে বৃক্ষের নাম কী বা সে বৃক্ষটি কী এ নিয়ে তাফসীরে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়, তবে সঠিক কথা হল: তা জান্নাতের গাছগুলোর অন্যতম একটি গাছ। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

অতঃপর উভয়ে জান্নাতে বসবাসকালে শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وٗرِىَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ)

"অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান যা তাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা তোমরা স্থায়ী হয়ে যাবে এজন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।" (সূরা আ'রাফ ৭:২০)

এমনকি শয়তান আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করে বলল, আমি তোমাদের কল্যাণকামী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ لا فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ)

"সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল: আমি তো তোমাদের কল্যাণকারীদের একজন। এভাবে সে তাদের উভয়কে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করল।" (সূরা আ'রাফ ৭:২১-২২)

এভাবে প্ররোচিত করে শয়তান জান্নাতের নেয়ামত থেকে তাদেরকে অপদস্থ ও অপমানিত করে বের করে দিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা উভয়কে সম্বোধন করে বললেন; "আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করিনি এবং তোমাদেরকে বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্র"?"

আল্লাহ তা'আলা এরূপ অন্যত্র বলেন:

(وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَّكُمَآ إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ)

"তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন: 'আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে বারণ করিনি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, শয়তান তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্র"?" (সূরা আ'রাফ ৭:২২)

তাদের এ অপরাধের জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ জারি করলেন:

(وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ)

"এবং আমি বললাম, নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্র"। আর পৃথিবীতেই তোমাদের জন্য এক নির্দিষ্টকালের বসবাস ও ভোগ-সম্পদ রয়েছে।"

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা আদমকে বললেন, আমি তোমাকে যে গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছি সে গাছের ফল খেতে কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল। সে বলল: হাওয়া আমাকে তা সুশোভিত করে দেখিয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন: আমি তার শাস্তিস্বরূপ গর্ভধারণ বেদনা ও প্রসব বেদনা দিয়েছি। (দুররুল মানসুর, ১/১৩২, ফাতহুর কাদীর, ১১১, আল মাত্বালিব আল আলিয়া- কিতাবুল হায়েয। হাদীসটি মাওকুফ কিন্তু তার সনদ সহীহ)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আদমকে হিন্দুস্তানে পাঠানো হয়েছিল এবং হাওয়াকে জেদ্দায়। হাওয়া (আঃ)-কে আদম (আঃ) খুঁজতে খুঁজতে মুযদালিফায় একত্রিত হন। হাওয়া তাকে জড়িয়ে ধরল। এ জন্য মুযদালিফাকে মুযদালিফা বলা হয়।

অর্থাৎ মানুষের শত্রু শয়তান এবং শয়তানের শত্রু মানুষ। শয়তান মানুষের শত্রু, একথা তো সুস্পষ্ট। কারণ সে মানুষকে আল্লাহর হুকুম পালনের পথ থেকে সরিয়ে রাখার এবং ধ্বংসের পথে পরিচালনা করার চেষ্টা করে। কিন্তু শয়তানের শত্রু মানুষ, একথার অর্থ কি? আসলে শয়তানের প্রতি শত্রুতার মনোভাব পোষণ করাই তো মানবতার দাবী। কিন্তু প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার সামনে সে যে সমস্ত প্রলোভন এনে হাযির করে মানুষ সেগুলোর দ্বারা প্রতারিত হয়ে তাকে নিজের বন্ধু ভেবে বসে। এই ধরনের বন্ধুত্বের অর্থ এ নয় যে, প্রকৃতপক্ষে শত্রুতা বন্ধুত্বে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, এক শত্রু আর এক শত্রুর হাতে পরাজিত হয়েছে এবং তার জালে ফেঁসে গেছে।

[১] (زَلَّةٌ) শব্দের অর্থ বিচ্যুতি বা পদস্খলন। অর্থাৎ শয়তান আদম ও হাওয়া 'আলাইহিমাস সালামকে পদস্খলিত করেছিল বা তাদের বিচ্যুতি ঘটিয়েছিল। কুরআনের এসব শব্দে পরিস্কার এ কথা বোঝা যায় যে, আদম ও হাওয়া 'আলাইহিস সালাম কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম লংঘন সাধারণ পাপীদের মত ছিল না, বরং শয়তানের প্রতারণায় প্রতারিত হয়েই তারা এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। পরিণামে যে গাছের ফল নিষিদ্ধ ছিল, তা খেয়ে বসলেন। এ বর্ণনার দ্বারা বোঝা গেল যে, আদম ''আলাইহিস সালামকে বিশেষ গাছ বা তার ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারেও সাবধান করে দেয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদেরকে পাপে লিপ্ত করে না দেয়। এরপরও আদম ''আলাইহিস সালাম এর তা খাওয়া বাহ্যিকভাবে পাপ বলে গণ্য। অথচ নবীগণ পাপ থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র। সঠিক তথ্য এই যে, এখানে কয়েকটি ব্যাপারে আলেমদের ইজমা তথা ঐক্যমত সংঘটিত হয়েছেঃ

১) নবীগণ উম্মতের নিকট আল্লাহ্র নির্দেশ পৌছানোর ব্যাপারে যাবতীয় ভুল-ত্রুটি বা পাপ হতে মুক্ত।

২) অনুরূপভাবে মর্যাদাহানিকর নিম্নমানের কর্মকাণ্ড থেকেও মুক্ত।

৩) তাদের দ্বারা মর্যাদাহানিকর নয় এমন সগীরা গোনাহ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে কোন প্রকার গোনাহ বা ভুলের উপর অবস্থান করতে দেননা। অর্থাৎ তাদের দ্বারা কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে তাদেরকে সাবধান করা হয়, যাতে তারা তাওবা করে সংশোধন করে নেন। ফলে তাদের মর্যাদা পূর্বের চেয়ে আরও বেশী বৃদ্ধি পায়।

[২] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “সূর্য যে দিনগুলোতে উদিত হয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন হচ্ছে জুম'আর দিন। এতে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এতেই জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। আর এ দিনই তাকে জান্নাতে থেকে বের করা হয়েছে "[মুসলিম: ৮৫৪] এখানে এ বিতর্ক অনাবশ্যক যে, শয়তান জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর আদম ''আলাইহিস সালামকে প্রতারিত করার জন্য কিভাবে আবার সেখানে প্রবেশ করলো? কারণ, শয়তানের প্রবঞ্চনার জন্য জান্নাতে প্রবেশের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা শয়তান ও জীন জাতিকে দূর থেকেও প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

সুরা: আল-বাক্কারাহ

আয়াত নং :-৩৭

فَتَلَقّٰۤی اٰدَمُ مِنۡ رَّبِّہٖ کَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَیۡہِ ؕ اِنَّہٗ ہُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیۡمُ

তখন আদম তার রবের কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য শিখে নিয়ে তাওবা করলো। তার রব তার এই তাওবা কবুল করে নিলেন। কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

৩৭ নং আয়াতের তাফসীর:

অতঃপর আদম ও হাওয়া তাদের অপরাধ বুঝতে পেরে আল্লাহ তা‘আলার কাছে অনুশোচনা ও তাওবাহ করল। সে তাওবার বাক্যও আল্লাহ তা‘আলার কাছ থেকে শিখে নিলেন।

(رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ)

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।’ (সূরা আ‘রাফ ৭:২৩)

কেউ এখানে একটি জাল হাদীসের আশ্রয় নিয়ে বলেন যে, আদম (আঃ) আল্লাহ তা‘আলার আরশের ওপর ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’লেখা দেখেন এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওসীলা গ্রহণ করে দু‘আ করেন; ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাঁেক ক্ষমা করে দেন। এটা ভিত্তিহীন বর্ণনা এবং কুরআনের বর্ণনার পরিপন্থী। এ ছাড়া এটা আল্লাহ তা‘আলার বর্ণিত তরীকারও বিপরীত। প্রত্যেক নাবী সব সময় সরাসরি আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করেছেন। অন্য কোন নাবী ও অলীর ওসীলা বা মাধ্যম ধরেননি। কাজেই নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-সহ সকল নাবীদের দু‘আ করার নিয়ম এটাই ছিল যে, তাঁরা বিনা ওসীলা ও মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার দরবারে সরাসরি দু‘আ করেছেন।

অর্থাৎ আদম (আঃ) যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, তিনি আল্লাহর নাফরমানির পথ পরিহার করে তাঁর হুকুম মেনে চলার পথ অবলম্বন করতে চাইলেন এবং তাঁর মনে যখন নিজের রবের কাছে নিজের গোনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার আকাঙ্ক্ষা জাগলো তখন ক্ষমা প্রার্থনা করার ভাষা তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাঁর অবস্থা দেখে আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনার ভাষা তাঁকে শিখিয়ে দিলেন। তাওবার আসল অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা। বান্দার পক্ষ থেকে তাওবার অর্থ হচ্ছে এই যে, সে সীমালঙ্ঘন ও বিদ্রোহের পথ পরিহার করে বন্দেগীর পথে পা বাড়িয়েছে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওবা করার অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজের লজ্জিত ও অনুতপ্ত দাসের প্রতি অনুগ্রহ সহকারে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং বান্দার প্রতি তাঁর দান পুনর্বার বর্ষিত হতে শুরু করেছে।

গোনাহর ফল অনিবার্য এবং মানুষকে অবশ্যি তা ভোগ করতে হবে, কুরআন এ মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এটা মানুষের মনগড়া ভুল মতবাদগুলোর মধ্যে একটি বড়ই বিভ্রান্তিকর মতবাদ। কারণ যে ব্যক্তি একবার গোনাহে লিপ্ত হয়েছে এই মতবাদ তাকে চিরকালের জন্য হতাশার সাগরে নিক্ষেপ করে। একবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে ঐ ব্যক্তি যদি তার অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় এবং ভবিষ্যতে সৎ-সুন্দর জীবন যাপন করতে আগ্রহ হয়, তাহলে এই মতবাদ তাকে বলে তোমার বাঁচার কোন আশা নেই, যা কিছু তুমি করে এসেছো তার ফল অবশ্যি তোমাকে ভোগ করতে হবে। এর বিপরীত পক্ষে কুরআন বলে, সৎকাজের পুরস্কার ও অসৎকাজের শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে। তোমরা যে সৎকাজের পুরস্কার পাও সেটা তোমাদের সৎকাজের স্বাভাবিক ফল নয়। সেটা আল্লাহর দান। তিনি চাইলে দান করতে পারেন, চাইলে নাও করতে পারেন। অনুরূপভাবে তোমরা যে অসৎকাজের শাস্তি লাভ করো সেটা তোমাদের অসৎকাজের অনিবার্য ফল নয়। বরং এ ব্যাপারে আল্লাহর ক্ষমতা ও ইখতিয়ার রয়েছে, তিনি চাইলে ক্ষমা করতে এবং চাইলে শাস্তি দিতে পারেন। তবে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত তাঁর জ্ঞানের সাথে গভীর সূত্রে আবদ্ধ। তিনি জ্ঞানী হবার কারণে তাঁর ক্ষমতা কর্তৃত্ব অন্ধের মতো ব্যবহার করেন না। কোন সৎকাজের পুরস্কার দেয়ার সময় বান্দা আন্তরিকতা সহকারে, সাচ্চা নিয়তে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই সৎকাজটি

করেছে, এ দিকটি বিবেচনা করেই তিনি তাকে পুরস্কৃত করেন। আর কোন সৎকাজকে প্রত্যাখ্যান করলে এই উদ্দেশ্যে করেন যে, তার বাইরের রূপটি ছিল ঠিক সৎকাজের মতোই কিন্তু তার ভেতরে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নির্ভেজাল প্রেরণা ও ভাবধারা কার্যকর ছিল না। অনুরূপভাবে বিদ্রোহাত্মক ধৃষ্টতা সহকারে কোন অসৎকাজ করা হলে তার পেছনে যদি লজ্জার মনোভাবের পরিবর্তে আরো বেশী অপরাধ করার প্রবণতা সক্রিয় থাকে তাহলে এ ধরনের অপরাধের তিনি শাস্তি দিয়ে থাকেন। আর যে অসৎকাজ করার পর বান্দা লজ্জিত হয় এবং ভবিষ্যতে নিজের সংশোধন প্রয়াসী হয় এই ধরনের অসৎকাজে ত্রুটি তিনি নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেন। মারাত্মক ধরনের অপরাধী কট্টর কাফেরের জন্যও আল্লাহর দরবার থেকে নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। তবে শর্ত হচ্ছে, সে যদি তার অপরাধ স্বীকার করে, নিজের নাফরমানির জন্য লজ্জিত হয় এবং বিদ্রোহের মনোভাব ত্যাগ করে আনুগত্যের পথে এগিয়ে চলতে প্রস্তুত হয়, তাহলে আল্লাহ তার গোনাহ ও ত্রুটি মাফ করে দেবেন।

[১] আদম ''আলাইহিস সালাম চরমভাবে বিচলিত হলেন। মহান আল্লাহ্ অন্তর্যামী এবং অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়। এ করুণ অবস্থা দেখে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ক্ষমা প্রার্থনারীতি সম্বলিত কয়েকটি বচন তাদেরকে শিখিয়ে দিলেন। তারই বর্ণনা এ আয়াতসমূহে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আদম ''আলাইহিস সালাম স্বীয় প্রভুর কাছ থেকে কয়েকটি শব্দ লাভ করলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি করুণা করলেন। অর্থাৎ তাদের তাওবা গ্রহণ করে নিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি মহা ক্ষমাশীল এবং অতি মেহেরবান। কিন্তু যেহেতু পৃথিবীতে আগমনের মধ্যে আরও অনেক তাৎপর্য ও কল্যাণ নিহিত ছিল – যেমন, তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে ফেরেশতা ও জ্বিন জাতির মাঝামাঝি এক নতুন জাতি – 'মানব' জাতির আবির্ভাব ঘটা, তাদেরকে এক ধরনের কর্ম স্বাধীনতা দিয়ে তাদের প্রতি শরীয় বিধান প্রয়োগের যোগ্য করে গড়ে তোলা এবং অপরাধীর শাস্তি বিধান, শরীআতী আইন ও নির্দেশাবলী প্রবর্তন। এই নতুন জাতি উন্নতি সাধন করে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবে।

[২] যেসব বাক্য আদম ''আলাইহিস সালামকে তাওবার উদ্দেশ্যে বলে দেয়া হয়েছিল, তা কি ছিল? এ সম্পর্কে মুফাসসির সাহাবাগণের কয়েক ধরনের বর্ণনা রয়েছে। ইবনে আব্বাসের অভিমতই এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যা কুরআনুল কারীমের অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে

(رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَاوَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ)

“হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যাব "[সূরা আল-আরাফঃ ২৩]

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যখন তাদেরকে তাওবার এই বাক্যগুলো শিখিয়ে দেয়া হলো, তখন আদম ''আলাইহিস সালাম যথোচিত মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে তা গ্রহণ করলেন।

[৩] (তাওবা) এর প্রকৃত অর্থ, ফিরে আসা। যখন তাওবার সম্বন্ধ মানুষের সংগে হয়, তখন তার অর্থ হবে তিনটি বস্তুর সমষ্টি:- এক. কৃত পাপকে পাপ মনে করে সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। দুই. পাপ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা। তিন. ভবিষ্যতে আবার এরূপ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা। আর যদি পাপ বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত হয় তবে তা ফেরৎ দেয়া বা তার থেকে মাফ নিয়ে নেয়া।

এ বিষয়গুলোর যেকোন একটির অভাব থাকলে তাওবা হবে না। সুতরাং মৌখিকভাবে 'আল্লাহ্ তাওবা" বা অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ করা নাজাত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। আয়াতে বর্ণিত (فَتَابَ عَلَيْهِ) এর মধ্যে তাওবার সম্বন্ধ আল্লাহ্র সাথে। এর অর্থ তাওবা গ্রহণ করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করলেন। এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাওবা গ্রহণের অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ নয়। ইয়াহুদী ও নাসারগণ এ ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুলে পড়ে আছে। তারা পাদ্রী-পুরোহিতদের কাছে কিছু হাদিয়া উপঢৌকনের বিনিময়ে পাপ মোচন করিয়ে নেয় এবং মনে করে যে, তারা মাফ করে দিলেই আল্লাহ্র নিকটও মাফ হয়ে যায়। বর্তমানে বহু মুসলিমও এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে। তারা কোন কোন পীরের কাছে তাওবা করে এবং মনে করে যে, পীর মাধ্যম হয়ে আল্লাহ্র কাছ থেকে তার পাপ মোচন করিয়ে নেবেন। অথচ কোন পীর বা আলেম কারো পাপ মোচন করিয়ে দিতে পারেন না।

আদম (আঃ) অনুতপ্ত হৃদয়ে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান

যে কথাগুলো আদম (আঃ) শিখেছিলেন তা কুর'আন মাজীদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তা হচ্ছেঃ

﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾

তারা বললোঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বো। (৭ নং সূরাহ্ আ'রাফ, আয়াত নং ২৩) অধিকাংশ লোকের এটাই অভিমত।

মুজাহিদ (রহঃ), সা'ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আল কারাজী (রহঃ), খালিদ ইবনু মাদান (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং 'আবদুর রহমান ইবনু যায়দ ইবনু আসলাম (রহঃ)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/১৩৬, তাফসীর তাবারী ১/৫৪৩, ৫৪৬)

ইমাম সুদ্দী (রহঃ) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেন, আদম (আঃ) বললেনঃ হে আমার রাব্ব! আপনিই কি আমাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেননি? মহান আল্লাহ বলেনঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ আপনি কি আমার ভিতর রূহ ফুঁকে দেননি? তিনি উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। আদম (আঃ) বললেনঃ যখন আমি হাঁচি দিই তখন কি আপনি বলেননি যে, মহান আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন? আপনার রহমত কি আপনার ক্রোধের ওপর অগ্রগামী নয়? উত্তরে মহান আল্লাহ বলেনঃ হ্যাঁ। আদম (আঃ) বললেনঃ আপনি আমার ভাগ্যে এরূপ খারাপ কাজ লিপিবদ্ধ করেছিলেন? বলা হলোঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ যদি আমি অনুতপ্ত হই তাহলে আপনি কি আমাকে জান্নাতে ফেরত নিবেন? মহান আল্লাহ বললেনঃ হ্যাঁ। (তাফসীর তাবারী ১/৫৪৩) আল আউফী (রহঃ), সা'ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ), সা'ঈদ ইবনু মা'বাদ (রহঃ) এবং ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাফসীর তাবারী ১/৫৪২) ইবনু যুবাইর (রহঃ) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে এবং ইবনু যুবাইর (রহঃ) থেকে হাকিম (রহঃ) তার মুস্তাদরাক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (মুসতাদরাক হাকীম হাঃ ২/৫৪৫) হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এর বর্ণনাধারা সহীহ। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ﴿إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾যে অনুতপ্ত হৃদয়ে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

﴿اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ﴾

তারা কি এটা অবগত নয় যে, মহান আল্লাহই নিজ বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন? (৯ নং সূরাহ্ তাওবাহ, আয়াত নং ১০৪) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿وَ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ﴾

যে কেউ দুষ্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে। (৪ নং সূরাহ্ নিসা, আয়াত নং ১১০)

অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ ﴿وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا﴾

যে ব্যক্তি তাওবাহ করে ও সৎ কাজ করে। (২৫ নং সূরাহ্ ফুরকান, আয়াত নং ৭১) এসব আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের তাওবাহ কবূল করে থাকেন। ঐ রকমই এখানেও রয়েছে যে, সেই মহান আল্লাহ তাওবাহকারীদের তাওবাহ কবূলকারী এবং অত্যন্ত দয়ালু। আল্লাহ তা'আলার করুণা ও দয়া এতো সাধারণ ও ব্যাপক যে, তিনি তাঁর পাপী বান্দাদেরকেও স্বীয় রহমতের দরজা হতে ফিরিয়ে দেননা। সত্যিই তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি বান্দাদের অনুতাপ গ্রহণকারী এবং পরম দয়ালু।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৩৮

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًاۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

আমরা বললাম, "তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। এরপর যখন আমার পক্ষ থেকে কোন হিদায়াত তোমাদের কাছে পৌঁছুবে তখন যারা আমার সেই হিদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের জন্য থাকবে না কোন ভয় দুঃখ বেদনা।

৩৮ নং আয়াতের তাফসীর:

অতঃপর আদম ও হাওয়া তাদের অপরাধ বুঝতে পেরে আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুশোচনা ও তাওবাহ করল। সে তাওবার বাক্যও আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে শিখে নিলেন।

(رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ)

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' (সূরা আ'রাফ ৭:২৩)

কেউ এখানে একটি জাল হাদীসের আশ্রয় নিয়ে বলেন যে, আদম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার আরশের ওপর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'লেখা দেখেন এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওসীলা গ্রহণ করে দু'আ করেন; ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দেন। এটা ভিত্তিহীন বর্ণনা এবং কুরআনের বর্ণনার পরিপন্থী। এ ছাড়া এটা আল্লাহ তা'আলার বর্ণিত তরীকারও বিপরীত। প্রত্যেক নাবী সব সময় সরাসরি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেছেন। অন্য কোন নাবী ও অলীর ওসীলা বা মাধ্যম ধরেননি। কাজেই নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-সহ সকল নাবীদের দু'আ করার নিয়ম এটাই ছিল যে, তাঁরা বিনা ওসীলা ও মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সরাসরি দু'আ করেছেন।

তারপর আল্লাহ তা'আলা উভয়ের তাওবাহ কবূল করে দুনিয়াতে প্রেরণ করলেন। দুনিয়াতে আদম ও হাওয়াকে পাঠিয়ে বলে দিলেন- তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করবে তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং কোন দুশ্চিন্তাও নেই। অর্থাৎ পরকালে সকল প্রকার ভয় ও হতাশামুক্ত থাকবে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًىأ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى)

“পরে আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎ পথের নির্দেশ আসলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাবে না।”(সূরা ত্বা-হা: ২০:১২৩)

যে ব্যক্তি আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলা প্রদত্ত হিদায়াত অনুসরণ করবে সে ব্যক্তি চারটি জিনিস থেকে মুক্ত থাকবে।

১. দুশ্চিন্তা, ২. ভয়-ভীতি, ৩. পথভ্রষ্টতা, ৪. দুর্ভাগ্য। (তাফসীরে সা‘দী পৃঃ ২৭)

আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর বিষয়কে কেন্দ্র করে আল্লাহ তা‘আলা সকল আদম সন্তানকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন:

(يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ط إِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ط إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ)

“হে বানী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকায় না ফেলে- যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে (আদম-হাওয়া) সে জান্নাত হতে বহিষ্কার করেছিল, তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য বিবস্ত্র করেছিল। সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। যারা ঈমান আনে না, শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি।”(সূরা আ‘রাফ ৭:২৭)

এই বাক্যটির পুনরাবৃত্তি তাৎপর্যপূর্ণ। আগের বাক্যে বলা হয়েছে আদম তাওবা করলেন এবং আল্লাহ তা কবুল করে নিলেন। এর অর্থ এই দাঁড়ালো, আদম তাঁর নাফরমানির জন্য আযাবের হকদার হলেন না। গোনাহগারীর যে দাগ তাঁর গায়ে লেগেছিল তা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। না এ দাগের কোন চিহ্ন তাঁর বা তাঁর বংশধরদের গায়ে রইলো, ফলে আর না এ প্রয়োজন হলো যে, আল্লাহর –একমাত্র পুত্রকে (মায়াযাল্লাহ) (নাউযুবিল্লাহ) বনী আদমের গোনাহর কাফফারাহ আদায় করার জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়ে শূলে চড়াতে হলো। বিপরীত পক্ষে মহান আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামের কেবল তাওবাই কবুল করে ক্ষান্ত হননি এবং এরপর আবার তাঁকে নবুওয়াতও দান করলেন। এভাবে তিনি নিজের বংশধরদেরকে সত্য –সহজ পথ দেখিয়ে গেলেন।এখানে আবার জান্নাত থেকে বের করে দেয়ার হুকুমের পুনরাবৃত্তি করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, আদমকে পৃথিবীতে না নামিয়ে জান্নাতে রেখে দেয়া তাওবা কবুলিয়াতের অপরিহার্য দাবী ছিল না। পৃথিবী

তাঁর জন্য দারুল আযাব বা শাস্তির আবাস ছিল না। শাস্তি দেয়ার জন্য তাঁকে এখানে পাঠানো হয়নি। বরং তাঁকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। জান্নাত তাঁর আসল কর্মস্থল ছিল না। সেখান থেকে বের করে দেয়ার হুকুম তাঁকে শাস্তি দেয়ার পর্যায়ভুক্ত ছিল না। তাঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়াটাই ছিল মূল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

জগতের চিত্র

জান্নাত থেকে বের করার সময় আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ) ও অভিশপ্ত ইবলীসকে যে সংবাদ দেয়া হয়েছিলো তারই বর্ণনা হচ্ছে যে, জগতে কিতাবাদি ও নবী রাসূলগণকে পাঠানো হবে, অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ করা হবে, দালীল প্রমাণাদি বর্ণিত হবে, সত্যপথ প্রকাশ করে দেয়া হবে। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/১৩৯) সূরাহ্ তা-হা'য় এটাই বলা হয়েছেঃ

﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَ لَا يَشْقٰى﴾

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা উভয়ে একই সাথে জান্নাত হতে নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু; পরে আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎ পথের নির্দেশ এলে, যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ কষ্ট পাবে না। (২০ নং সূরাহ্ তা-হা, আয়াত নং ১২৩) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, সে কখনো বিপথগামী হবে না এবং পরকালেও ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। (তাফসীর তাবারী ১৮/৩৮৯) নিম্নের আয়াতটি এ কথারই প্রমাণ বহন করেঃ

﴿وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى﴾

যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবন যাপন হবে সঙ্কুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উত্থিত করবো অন্ধ অবস্থায়। (২০ নং সূরাহ্ তা-হা, আয়াত নং ১২৪)

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৩৯

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

আর যারা একে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে তারা হবে আগুনের মধ্যে প্রবেশকারী। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।”

৩৯ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] আরবীতে “আয়াত” এর আসল মানে হচ্ছে নিশানী বা আলামত। এই নিশানী কোন জিনিসের পক্ষ থেকে পথ নির্দেশ দেয়। কুরআনে এই শব্দটি চারটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও এর অর্থ হয়েছে নিছক আলামত বা নিশানী। কোথাও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের নিদর্শনসমূহকে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র আয়াত। কারণ এ বিশ্ব জাহানের অসীম ক্ষমতাধর আল্লাহ্‌র সৃষ্ট প্রতিটি বস্তুই তার বাহ্যিক কাঠামোর অভ্যন্তরে নিহিত সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করছে। কোথাও নবী-রাসূলগণ যেসব মু'জিযা দেখিয়েছেন সেগুলোকে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র আয়াত। কারণ এ নবী-রাসূলগণ যে এ বিশ্ব জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভূর প্রতিনিধি এ মু'জিযাগুলো ছিল আসলে তারই প্রমাণ ও আলামত। কোথাও কুরআনের বাক্যগুলোকে আয়াত বলা হয়েছে। কারণ, এ বাক্যগুলো কেবল সত্যের দিকে পরিচালিত করেই ক্ষান্ত নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে কোন কিতাবই এসেছে, তার কেবল বিষয়বস্তুই নয়, শব্দ, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্য গঠনরীতির মধ্যেও এ গ্রন্থের মহান মহিমান্বিত রচয়িতার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছে। কোথায় আয়াত’ শব্দটির কোন অর্থ গ্রহণ করতে হবে তা বাক্যের পূর্বাপর আলোচনা থেকে সর্বত্র সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

[২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আর যারা জাহান্নামবাসী হিসেবে সেখানকার অধিবাসী হবে, তারা সেখানে মরবেও না বাঁচবেও না” [মুসলিম: ১৮৫] অর্থাৎ কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকরা সেখানে স্থায়ী হবে। সুতরাং তাদের জাহান্নামও স্থায়ী।

আরবীতে আয়াতের আসল মানে হচ্ছে নিশানী বা আলামত। এই নিশানী কোন জিনিসের পক্ষ থেকে পথ নির্দেশ দেয়। কুরআনে এই শব্দটি চারটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও এর অর্থ হয়েছে নিছক আলামত বা নিশানী। কোথাও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনসমূহকে বলা হয়েছে আল্লাহর আয়াত। কারণ এই বিশ্ব-জাহানের অসীম ক্ষমতাধর আল্লাহর সৃষ্ট প্রতিটি বস্তুই তার বাহ্যিক কাঠামোর অভ্যন্তরে নিহিত সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করছে। কোথাও নবী-রসূলগণ যেসব ‘মু’জিযা’ (অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম) দেখিয়েছেন সেগুলোকে বলা হয়েছে আল্লাহর আয়াত। কারণ নবী-রসূলগণ যে এ বিশ্ব-জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন প্রভুর প্রতিনিধি এই মু’জিযাগুলো ছিল আসলে তারই প্রমাণ ও আলামত। কোথাও কুরআনের বাক্যগুলোকে আয়াত বলা হয়েছে। কারণ এ বাক্যগুলো কেবল সত্যের দিকে পরিচালিত করেই ক্ষান্ত নয় বরং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কোন কিতাবই এসেছে, তার কেবল বিষয়বস্তুই নয়, শব্দ, বর্ণনাভংগী ও বাক্য গঠনরীতির মধ্যেও এই গ্রন্থের মহান মহিমান্বিত রচয়িতার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে

অনুভূত হয়েছে। কোথায় 'আয়াত' শব্দটি কোন্ অর্থ গ্রহণ করতে হবে তা বাক্যের পূর্বাপর আলোচনা থেকে সর্বত্র সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

এটা হচ্ছে সৃষ্টির প্রথম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহর স্থায়ী ফরমান। তৃতীয় রুকূ'তে এটিকেই আল্লাহর 'অঙ্গীকার' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নিজেই নিজের পথ তৈরি করে নেয়া মানুষের কাজ নয়। বরং একদিকে বান্দা এবং অন্যদিকে খলীফার দ্বিবিধ ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে তার রব-নির্ধারিত পথের অনুসরণ করার জন্যই সে নিযুক্ত হয়েছে। দু'টো উপায়ে এ পথের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

এক, কোন মানুষের কাছে সরাসরি আল্লাহ পক্ষ থেকে অহী আসতে পারে।

দুই, অথবা যে মানুষটির কাছে অহী এসেছে, তার অনুসরণ করা যেতে পারে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের তৃতীয় কোন পথ নেই। এ দু'টি পথ ছাড়া বাদবাকি সমস্ত পথই মিথ্যা ও ভুল। শুধু ভুলই নয়, প্রত্যক্ষ বিদ্রোহের পথও। আর এর শাস্তি জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নয়।কুরআন মজীদের সাতটি জায়গায় আদমের জন্ম ও মানবজাতির সূচনা কালের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। এ সাতটি জায়গার মধ্যে এটিই হচ্ছে প্রথম এবং আর ছয়টি জায়গায় হচ্ছেঃ সূরা আল আ'রাফ ২য় রুকু ', আল হিজর ৩য় রুকু , বনী ইসরাঈল ৭ম রুকূ' , আল কাহাফ ৭ম রুকু ', তা-হা ৭ম রুকু' , এবং সা'দ ৫ম রুকু' । বাইবেলের জন্ম অধ্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদেও এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বাইবেল ও কুরআন উভয়ের বর্ণনার তুলনা করার পর একজন বিবেকবান ও সুস্থ্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি নিজেই উভয় কিতাবের পার্থক্য অনুধাবন করতে পারবেন।আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টিকালীন আল্লাহ ও ফেরেশতাদের মধ্যকার কথাবার্তার বর্ণনা তালমূদেও উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু কুরআন বর্ণিত কাহিনীতে যে গভীর অন্তর্নিহিত প্রাণসত্তার সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানে তা অনুপস্থিত। বরং সেখানে কিছু রসাত্মক আলাপও পাওয়া যায়। যেমন, ফেরেশতারা আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হচ্ছে?' জবাবে আল্লাহ বললেন, 'এ জন্য যে, তাদের মধ্যে সৎলোক জন্ম নেবে। ' অসৎলোকদের কথা আল্লাহ বললেন না। অন্যথায় ফেরেশতারা মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর পরিকল্পনার পক্ষে অনুমোদন দিতেন না। Talmudic Miscellany, paul Issac Herson, Lonon 1880. P . 294-95

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আল্লাহ তা'আলার নিকট আদম (আঃ) ও তাঁর সন্তানদের মর্যাদার কথা জানতে পারলাম।

২. আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হলে নেয়ামতের পরিবর্তে শাস্তি দেন।

৩. কোন বস্তুর নাম বা ধরণ কুরআনে উল্লেখ না হলে এবং হাদীসেও এর বিবরণ না আসলে তা নিয়ে অহেতুক আলোচনা করা শরীয়তসম্মত নয়।

৪. শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্র“, তার কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক থাকা দরকার।

৫. কোন অপরাধ হয়ে গেলে তার ওপর অটল না থেকে বরং তা বর্জন করে অনুশোচিত হয়ে তাওবাহ করা ওয়াজিব।

৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত হিদায়াতের অনুসরণ করে চলবে সে দুশ্চিন্তা, ভয়-ভীতি, পথভ্রষ্টতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকবে।